Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌসী

রোলঃ 227020686

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌসী

রোলঃ 227020686

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌসী, আইডিঃ 227020686 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌসী

আইডিঃ 227020686

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমের প্রতি ইসলামের প্রথম বার্তাই- اِقْرَأْ- পড়, ইলম অর্জন কর। ইসলাম থেকে ইলমকে আলাদা করা অসম্ভব। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। ইলম ছাড়া ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন- কোনো ক্ষেত্রেই সত্যিকার অর্থে ইসলাম পালন সম্ভব নয়। তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি। -তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

ইলমের পরিচয়

‘ইলম’ (علم) কুরআন ও হাদীছে ব্যবহৃত একটি আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ হ’ল জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ‘বস্তুত প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে জ্ঞানী থাকেন’ *(ইউসুফ ১২/৭৬)*। পরিভাষায় বলা হয়, هو حصول صورة الشئ فى العقل ‘আক্বলের মধ্যে কোন বস্তুর আকৃতি অর্জিত হওয়া’।

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয। -মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না

শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় প্রকারের ইলম হচ্ছে, ফরযে কেফায়া, যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরয। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এককথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরয তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। -শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস, ৩৮৮৪; শারাফু আসহাবিল হাদীস, খতীব বাগদাদী, পৃ. ২৯; বুগইয়াতুল মুলতামিস, আলাঈ, পৃ. ৩৪

ইলমকে বলা হয় মাওকূফ আলাইহি অর্থাৎ দ্বীনের প্রতিটি আমল এর উপর নির্ভরশীল। ইমাম বুখারী রাহ. সহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম দিয়েছেন-

.باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعملِ

(সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম।)

এই কারণে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রাহ. বলেছেন, যে আমলের যে হুকুম তার ইলম হাসিল করারও একই হুকুম। অর্থাৎ যেই আমলটি ইসলামে ফরয তার ইলম অর্জনও ফরয। যেটা ওয়াজিব তার ইলম অর্জন করাও ওয়াজিব। যেটা সুন্নত তার ইলম অর্জনও সুন্নত। তদ্রুপ যেটা হারাম তার ইলম অর্জন করা ফরয। যা মাকরূহে তাহরীমী তার ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এককথায় ইসলামের যেই বিষয়টি যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ের ইলম অর্জন করাও তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া সঠিক আমল কখনোই সম্ভব নয়।যা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। -সূরা নাহ্ল (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَ یُزَكِّیْهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। -সূরা জুমুআহ (৬২) : ২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম হাসিল করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী আমাদের বিরূদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

یٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا.

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। -সূরা ফুরকান (২৫) : ৩০

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে। -সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দুআ শিখিয়েছেন-

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১১৪

আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। -সূরা তাওবা (৯) : ১২২

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না। -তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফযীলত বর্ণনা করেছেন যে, বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ. وَاللهِ لَيُعَلِّمَنّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ .

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?

আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। -আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।–

(১) মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম : কলম ইল্মের অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি

করেছেন। ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,.إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ, فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى

الأَبَدِ। ‘আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, ‘লিখ’। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই’।]
[তিরমিযী হা/২১৫৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৩।]
সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ’ল ‘সূরা ক্বলম’। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيّدوا العلم بالكتابة ‘তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল’।[হাকেম হা/৩৬০; দারেমী হা/৪৯৮।]
লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[বুখারী হা/১১৩]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ، ‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে

দিন। তিনি (ছাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও'।[বুখারী হা/১১২]

(২)ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয় : আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ইল্ম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন,وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيْمُ- 'অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (বাক্বারাহ ২/৩১-৩২)। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, 'হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের

অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?’ (বাক্বারাহ ২/৩৩)। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন’ (বাক্বারাহ ২/৩৩-৩৪)।

(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে : পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির (কাহাফ ১৮/৬৫), ২. লোকমান (লোকমান ৩১/১২), ৩. ত্বালূত (বাক্বারাহ ২/২৪৭)।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে অবতীর্ণ প্রথম বাণী ‘পড়’ : লিখার মত পড়াও ইলমের অন্যতম মাধ্যম। জাহেলী সমাজে ইসলামের আলো জ্বালানোর জন্য ‘উম্মী’ তথা ‘নিরক্ষর’ নবীকে (জুম‘আ ৬২/২) প্রথমে পড়া তথা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- ‘পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি

করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড হ’তে। পড়, আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না’ (‘আলাক্ব ৯৬/১-৫)।

(৫)ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো : মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ- ‘আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্তুতঃ আমরা একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ’ (শূরা ৪২/৫২)।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্খতা হ’ল মৃত ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ’ল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হ’ল আলো ও জীবন। মহান আল্লাহ বলেন,أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، ‘আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে’ (আন‘আম ৬/১২২)।

[ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৩২১; মিফতাহু দারিস সা'আদাহ ১/২৩১।]

(৬)আক্বীদা ও আমল ছহীহ হওয়ার ভিত্তি ইল্ম : কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ'ল ইল্ম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف :من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 'নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইল্মের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইল্মের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহ'লে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইল্ম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে'।[মিফতাহু দারিস সা'আদাহ পৃঃ ২।]

(৭)ইলম নবীদের উত্তরাধিকার : প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার

হ’ল। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، ‘অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে’।[আবু দাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাযার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাযারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাযারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবূ হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবূ হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবূ হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক ছালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত

করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাছ'।[ত্বাবরানী আওসাত্ব হা/২/১১৪; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/৮২।]

(৮)সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম : সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাঃ) বলেন,العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاقِ 'সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'।[ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, ১৫৬ পৃঃ; ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাশক ৫০/৫৭১; গাযালী, ইহইয়া উলূমুদ্দীন ১/১৭-১৮।]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী।[ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৯-২২৪।] তিনি প্রায় চল্লিশটি দিক উল্লেখ করেছেন। যেমন- ক. ইলম হ'ল নবীগণের মীরাছ, আর সম্পদ হ'ল ধনীদের

মীরাছ। খ. নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়। গ. সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়। ঘ. নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে। ঙ. সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না। চ. সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না। ছ. সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। জ. সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঝ. নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে। ঞ. সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

(৯)ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায় : দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইল্ম হ'ল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন,إِنَّ

الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আছর ১০৩/২-৩)। মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ'ল ইলম (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ বলেন,من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا 'যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা জরূরী'।

(১০)আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন : মু'আবিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন'।[26] আর যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন তাকেই মূলতঃ সর্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، 'আল্লাহ

যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুত জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না’ (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,إن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم، ‘নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা ইলমের জন্যই লাভ করেছে’।[ফাযলুল ইল্ম ওয়াল ওলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ:৮০।]

ছাহাবীগণ ভিন্ন ভিন্ন ইলমে পারদর্শী ছিলেন। কেউ হাদীছ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ), আনাস (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআন লিখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। যেমন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ), মু‘আবিয়া (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআনের তাফসীরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। কেউ আবার শৈশবেই গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) একদা বললেন, গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে অবগত কর সেটি কি গাছ? তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা হ'ল, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (ছোট হওয়ায়) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের বলে দিন, সেটি কি গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ'।[বুখারী হা/৬১]

(১১)মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে : দুনিয়াতে ইলম যেমন মর্যাদার বস্তু তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، 'আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[মুসলিম হা/৪৩১০।]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ 'মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ'তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হ'ল সেই ইলম, যা

সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে’।[ইবেন মাজাহ হা/২৪২, ইবনে খুজাইমাহ হা/২৪৯০।]

(১২)রাসূল (ছাঃ) কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের শহীদগণের দু’দু’জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ ‘তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু’জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ’লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা

অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি’।[বুখারী হা/১৩৫৩]

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثَةٍ :إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই

এর উপর আমল করা হোক বা না হোক।[-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯]

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

নিয়ত বিশুদ্ধ করা

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। মুমিন এজন্যই মুমিন যে, সে ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ত ঠিক রেখেছে অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ঈমান এনেছে। আর মুনাফিক এই কারণেই মুনাফিক যে, সে তার ঈমানের ক্ষেত্রে নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখেনি। খালেস নিয়তের দ্বারা বাহ্যত ছোট আমলও আল্লাহর দরবারে অনেক বড় হয়ে যায়। আবার নিয়তের গড়মিলের কারণে অনেক বড় আমলও বিফলে যায়।

ইলম শিক্ষা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارَ النَّارَ.

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

বিশিষ্ট বুযুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللهَ وَحَسُنَتْ نِيَّتُه.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে। -আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

ইলম অর্জনে এ নিয়ত থাকবে যে, ইলম অন্বেষণ করা, এর জন্য মেহনত করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন এবং তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পরিচয় পাওয়া যায়; তাঁর আদেশ-নিষেধ জানা যায় এবং সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান লাভ করা যায়। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর কালাম ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী জানা ও বোঝা যায়। ইলমের দ্বারা নিজের ও অন্যের সব ধরনের মূর্খতা দূরীভ‚ত হয়। সর্বোপরি ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় দ্বীন ও শরীয়তের দাওয়াত এবং দ্বীনের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার কাজ আঞ্জাম দেওয়া যায়। সুতরাং শুধু এসব উদ্দেশ্যেই একমাত্র আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা ইলম শিক্ষা করব এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করব।

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি

কেউ ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা করলে স্বাভাবিকভাবে দুই প্রকারের উপায় সামনে আসে। এক. কারো লেখা পাঠ করা। দুই. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা। এই দুই পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদব রয়েছে। প্রথম পদ্ধতির সবচে বড় উসূল হচ্ছে সেটা কার লেখা তা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।

এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। -সহীহ বুখারী ১/২৪

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিক্রের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। -সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন-

قالوا إِنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। -আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। -সহীহ মুসলিম ১/১৪

ইলমের জন্য দরকার মেহনত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে। -আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَؤُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ.

অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে। -ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে কষ্ট-মুজাহাদা শিকার করার ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অল্প বয়সী সাহাবীদের একজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করতেন। আর এলাকার সমবয়সী ছেলেদেরকেও বলতেন, চল আমরা সাহাবীদের কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করি। কেননা তাঁরা তো এখন অনেকেই জীবিত। বন্ধুরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, এত বড় বড় সাহাবী থাকতে কি মানুষেরা তোমার ইলমের মুখাপেক্ষী হবে? ফলে তারা যেত না আর তিনি গিয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করতেন।

তিনি বলেন, আমি যখন শুনতাম অমুক সাহাবীর কাছে ইলম আছে তাঁর বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতাম। কোনো সময় এমনও হত যে, সাহাবীর আসতে দেরি হচ্ছে আর আমিও ক্লান্ত। তখন আমি তাঁর অপেক্ষায় আমার চাদরখানাকে বালিশ বানিয়ে তাঁর দরজায় শুয়ে পড়তাম। আর বাতাসে ধূলা উড়ে এসে আমার শরীর ধূলা ধূসরিত হয়ে যেত। যখন সাহাবী বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর দরজায় আমাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখতেন; তখন বলতেন, আয় আল্লাহ! নবীজীর চাচাত ভাইয়ের এ কী অবস্থা! আমাকে সম্বোধন করে বলতেন, আপনার কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? আমার কাছে খবর পাঠালে আমি নিজেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাযির হতাম। তখন আমি বলতাম, কখনোই না। আমিই আপনার কাছে আসার বেশি মুখাপেক্ষী। এরপর আমি তাঁর থেকে হাদীসের জ্ঞান হাসিল করতাম।

একসময় যখন বড় বড় সকল সাহাবা একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন লোকজন দ্বীনী জ্ঞান হাসিল করার জন্য আমার চারপাশে ভিড় জমাতে লাগল। তখন ঐ আনসারী ছেলেরা আমাকে দেখে বলত-

كَانَ هَذَا الْفَتَى أَعْقَلَ مِنَّا.

এই যুবকই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। -সুনানে দারেমী, হাদীস ৫৭০; তবাকাতু ইবনে সা'দ ২/২৮৪

উস্তাদের দীর্ঘ সহচর্য গ্রহণ

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি। -ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

ইমাম মালেক রাহ বলেন-

كَانَ الرّجُلُ يَخْتلِفُ إِلَى الرّجُلِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلّمُ مِنْهُ.

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। -সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮

ইলমের ক্ষেত্রে ‘কানাআত’ বর্জনীয়

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের ‘কানাআত’ বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ :مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا.

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

সুতরাং ইলমের প্রতি আমার ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায়

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন-

لاَ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبِرٌ.

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না। -সহীহ বুখারী ১/৩৮

আর অহংকার তো মুমিনের সাথে যায় না। মুমিন হবে বিনয়ী। চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী। আমার আবার কিসের অহংকার! হযরত মূসা আ.-এর মতো মহান নবী যদি ইলমের জন্য হযরত খাযির আ.-এর পিছে পিছে ঘুরতে পারেন, ইলমের জন্য বহু কষ্ট শিকার ও সবর করতে পারেন; সেই তুলনায় আমি কে। আমার আবার কিসের অহংকার?!

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা

কারো সম্মান ও মর্যাদার ঘোষণা যদি স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দিয়ে থাকেন তবে তার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফেকির আলামত। আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। সুতরাং তাদের মর্যাদাকে আর কেউ ছোট করতে পারে না। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরূদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবুদ্দারদা রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًا أَوْ مُتَّبِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ.
قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ :مَنِ الْخَامِسُ؟ قَالَ :الْمُبْتَدِعُ.

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম

ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি। -আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আহলে ইলমের সাক্ষ্যকে দলিলরূপে পেশ করেছেন-

شَهِدَ اللهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآىِٕمًۢا بِالْقِسْطِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ.

আল্লাহ স্বয়ং এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশতাগণ ও ‘উলুল ইলম’ও যে, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি ইনসাফের সাথে (বিশ্বজগতের) নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। তাঁর ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতও পরিপূর্ণ। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮

বিশিষ্ট তাফসীরকারক তাবেঈ সুদ্দী রাহ. বলেন, ‘উলুল ইলম’ দ্বারা উদ্দেশ্য-

جَمِيع عُلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ.

মুমিনদের আলেমগণ।

ইমাম কালবীও এমনটি বলেন। -তাফসীরে বাগাবী ১/৪২০; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ২/৬১৭

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. সুদ্দী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। -তাফসীরে কুরতুবী ৪/৪১

এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

إِنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتّخَذَ النّاسُ رُءُوسًا جُهّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلّوا وَأَضَلّوا.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইলমকে মানুষদের থেকে ছিনিয়ে তুলে নেবেন না। তবে তিনি ইলমকে উঠিয়ে নেবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন (দুনিয়াতে) কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে যখন (দ্বীনের কোনো বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করা হবে; তারা না জেনে উত্তর দেবে। ফলে

তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৭৩

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন-

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.

আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুযার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫

আরো ইরশাদ করেন-

إِنّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنّمَا وَرّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো

(মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূ্ূ্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবি। একদিন পেশাজীবি ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবি ভাইকে বললে-

لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَتّى الْحِيتَان فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ২৬৮৫; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১

দ্র. কেউ কেউ এই হাদীসের-"لتضع أجنحتها" -এই বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন, 'ডানা বিছিয়ে দেয়া।' আবার কেউ বলেছেন এর অর্থ হল, 'তালিবুল ইলমের সম্মানে বিনয়াবনত হওয়া।' কেউ বলেছেন, 'উড্ডয়ন বন্ধ করে থেমে যাওয়া ও যিকিরের জন্য অবতরণ করা।' মূলত এ বাক্যের মাঝে এ সবক'টি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে। (মাআলিমুস সুনান ৪/১৮৩; মেরকাতুল মাফাতীহ ১/২৯৬ আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যায়)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের গুরুত্ব বোঝার এবং ইখলাস ও আদবের সাথে দ্বীনি ইলম অর্জনের তাওফিক দান করুন।

ইলম অর্জনের ফজিলত নিয়ে কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি :

আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾)طه :١١٤(﴿

অর্থাৎ বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। (ত্বা-হা ১১৪ আয়াত)

তিনি অন্যত্র বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾)الزمر :٩(﴿

অর্থাৎ বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? (যুমার ৯ আয়াত)

আল্লাহ আরও বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾)المجادلة﴿: ١١)

অর্থাৎ যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। (মুজাদালা **১১** আয়াত)

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,﴿

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾)فاطر :٢٨(

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে থাকে। (ফাত্বের ২৮ আয়াত)

১/১৩৮৪। মুআবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন।” (বুখারী) [1]

وَعَن مُعَاوِيةَ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم »مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ«. متفقٌ عَلَيْهِ

وعن معاوية رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم »من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين«. متفق عليه

[1] সহীহুল বুখারী ৭১, ৩১১৬, ৩৬৪১, ৭৩১২, ৭৪৬০, মুসলিম ১০৩৭, ইবনু মাজাহ ২২১, আহমাদ ১৬৩৯২, ১৬৪০৭, ১৬৪১৮, ১৬৪৩২, ১৬৪৪৬, ১৬৪৪৫১, ১৬৪৬০, ১৬৪৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৬৭, দারেমী ২২৪, ২২৬

ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেবল দু’জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।” (বুখারী ও মুসলিম) [1]

এখানে ঈর্ষা বলতে, অপরের ধন ও জ্ঞান দেখে মনে মনে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সেই সাথে এই কামনা থাকে না যে, অপরের ধ্বংস হয়ে যাক।

وَعَنِ ابنِ مَسعُود رضي الله عنه، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :»لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ :رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا« .متفقٌ عَلَيْهِ

وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها». متفق عليه

[1] সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩১৬, মুসলিম ৮১৬, ইবনু মাজাহ ৪২০৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮

আবূ মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা জমিনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সবজি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল

এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠালো না এবং আল্লাহর সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।” (বুখারী ও মুসলিম) [1]

وَعَن أَبي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :»مَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ، وَالعُشْبَ ،الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ؛ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ« .متفقٌ عَلَيْهِ

وعن ابي موسى رضي الله عنه، قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم :»مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا ؛ فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلا، والعشب ،الكثير، وكان منها اجادب امسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، واصاب طائفة منها اخرى انما هي قيعان ؛ لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا، ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به« .متفق عليه

[1] সহীহুল বুখারী ৭৯, মুসলিম ২২৮২, আহমাদ ২৭৬৮২

সাহাল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন, “আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উঁটনী অপেক্ষা উত্তম হবে।” (বুখারী-মুসলিম) [1]

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ رضي الله عنه:أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِعَليٍّ رضي الله عنه :»فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ« متفقٌ عَلَيْهِ .

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه:ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال لعلي رضي الله عنه :»فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم« متفق عليه .

[1] সহীহুল বুখারী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসলিম ২৪০৬, আবূ দাউদ ৩৬৬১, আহমাদ ২২৩১৪

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা (জ্ঞান) অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।” (মুসলিম) [1]

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ :»وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ« .رواه مسلم

وعن ابي هريرة رضي الله عنه :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال :»ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له طريقا الى الجنة« .رواه مسلم

[1] মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫৪, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬,

রাবী (আবূ হুরাইরা) রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানাবে, সে তার অনুসারীদের সমতুল্য নেকীর অধিকারী হবে; তাতে তাদের নেকীর কিছুই হ্রাস পাবে না।” (মুসলিম) [1]

وَعَنه أَيضاً رضي الله عنه :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قَالَ :»مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً« .رواه مسلم

وعنه ايضا رضي الله عنه :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، قال :»من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيىا« .رواه مسلم
[1] মুসলিম ২৬৭৪, তিরমিযী ২৬৭৪,

আবূ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর ফেরেশতাবর্গ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলিম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। আবেদের উপর আলিমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পরগম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইলমের (দ্বীনী

জ্ঞানভাণ্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী) [1]

وَعَن أَبي الدَّردَاءِ رضي الله عنه، قَالَ :سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ .

وعن ابي الدرداء رضي الله عنه، قال :سمعت رسول الله صلى . الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يقول :»من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر« .رواه ابو داود والترمذي

[1] আবূ দাউদ ৩৬৪১, দারেমী ৩৪২

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যাকে ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে (যদি উত্তর না দিয়ে) তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে (জাহান্নামের) আগুনের লাগাম পরানো হবে।” (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سُئِلَ عَن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم فكتمه، الجم يوم القيامة بلجام من نار». رواه ابو داود والترمذي، وقال: حديث حسن

[1] তিরমিযী ২৬৪৯,

রাবী (আবূ হুরাইরা) রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ

লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।” (আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সানাদ)[1]

وَعَنهُ، قَالَ :قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم :»مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لاَ يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَعْنِي :رِيحَهَا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

وعنه، قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :»من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله - عز وجل - لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني :ريحها . رواه ابو داود باسناد صحيح

[1] আবূ দাউদ ৩৬৬৪

আব্দুল্লাহ ইবনে ’আমর ইবনে ’আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন (অর্থাৎ আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ

ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।” (বুখারী ও মুসলিম) [1]

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ :سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :»إنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا .متفقٌ عَلَيْهِ

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول :»ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رووسا جهالا فسىلوا فافتوا بغير علم، فضلوا واضلوا .متفق عليه

[1] সহীহুল বুখারী ১০০,

তালিবে ইলমের আত্মমর্যাদা নিয়ে কিছু কথা...

অনেক দূরের কথা চিন্তা করে আমি এ কথাগুলো বলছি যে, আমাদের সমাজে ইলমের, তালিবে ইলমের এবং মাদরাসার কোনো মর্যাদা নেই। এটা আমাদেরকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। আর তা শুধু মুখের কথায় হয়ে যাবে না। নিজের যোগ্যতা দ্বারা, ব্যক্তিত্ব ও আচার আচরণ দ্বারা তা উদ্ধার করতে হবে। তোমাকে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। তোমার এই যোগ্যতা থাকতে হবে যে, তোমার পরিবারের যারা স্কুল-কলেজে পড়ে তাদের বলতে পার, তুমি কী বাংলা পড়! তোমার স্কুলে কী বাংলা পড়ায় আসো দেখি তোমার সাথে বাংলায় কথা বলি, তুমি বাংলা কতটুকু জান, আমি কতটুকু জানি দেখি।

আল্লাহ যদি তাওফীক দেন আমাদের তো যথেষ্ট সুযোগ আছে, যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, আমরা ওদের প্রতিটা পড়ার বিষয়কে নিজেদের বিষয় বানিয়ে নিতে পারি। কিন্তু আগে তো গোড়া মজবুত করতে হবে। গোড়াই তো মযুবত হচ্ছে না। এখনো তো আমরা নিজেদেরকে চিনতেই শিখিনি। তাই ওঝা না হয়েই যদি সাপ ধরতে যাও তাহলে তো পদে পদে ছোবল খাবে। আমাদের তো ইচ্ছা আছে সব সাপ-অংকের সাপ, বিজ্ঞানের সাপ, ভূগোলের সাপ সব আমাদের ঝাঁপিতে ভরব। ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আগে তো ওঝা হতে হবে। এখনো তো

মন্ত্র শিখিনি বাজান! ছোবল খাব কেন? যাই হোক এটা অন্য বিষয়।

তো গত রাতে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের বাবা ফোন করে বলছে যে, আমরা ছেলের বিয়ের তারিখ করে ফেলেছি। এখন ও ছোট ছেলে। ওকে আসতে হবে। আমি বললাম, ভাই! সংক্ষেপ কথা হল, আপনার এ ছেলে যে বর্ষে পড়ে কয়েকদিন আগে সে বর্ষের এক ছেলেকে আমরা এই কারণে বিদায় করে দিয়েছি। এখন তাকে কীভাবে ছুটি দেই? কিন্তু তার এক কথা-ছুটি দিতে হবে। নাহলে বিয়েটা ভেঙ্গে যাবে। আমি বললাম, বিয়ে ভেঙ্গে যাবে কেন? আপনারা আপনাদের কাজ করে ফেলেন। ছেলে এখানে লেখাপড়া করতে থাকুক। আমরা আপনাদের জন্য দুআ করি। বিয়ে ভাঙ্গবে কেন? আর যদি আপনি মনে করেন যে, আপনার ছেলের অনুপস্থিতিতে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে এত গুরুত্বপূর্ণ আপনার ছেলে তাহলে তার সুবিধামতো তারিখ করেননি কেন? কোনো জওয়াব নেই। না হুযুর! একটু ছুটি দেন। আরে ছুটি দিলে তো আপনার ছেলের ক্ষতি হবে। না হুযুর, দয়া করে একটু ছুটি দেন। আরে দয়া করেই তো ছুটি দিচ্ছি না। নির্দয় হলে তো ছুটি দিয়ে দিতাম। যে ছাত্রের বিষয়ে আমি নির্দয় হয়েছিলাম তার ফলাফল আমার সামনে আছে। ওরা বলেছিল দয়া করেন আমি নির্দয় হয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলাম। ঐ ছেলে এখনো জীবিত আছে। এখন আমি যদি তোমাকে ছুটি দেই

তাহলে তোমার প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা হবে। তোমার পরিবার হয়তো জানে না, না জেনে তো মানুষ কত অন্যায় করে। না জেনে তো মাও ছেলেকে বিষ খাইয়ে দেয়। ওষুধ মনে করে। কিন্তু আমি তো জানি তোমার কত বড় ক্ষতি হবে। এ তো চরম অমর্যাদা তোমার পরিবার তোমাকে করবে, তুমি তোমার মাদরাসাকে করবে, এটার তো ফল আছে। এরপর ঐ ছেলে নিজে এসে চোখের পানি ফেলছে। হুযুর, দয়া করে আমাকে দুই দিনের ছুটি দেন। আমি প্রথমে শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমি সব বোঝাচ্ছি সে আমার পায়ে ধরে বলে হুযুর, দুই দিনের ছূটি দেন। তখন আমার ...। আমি আসলে তার কাছে মাফ চাচ্ছি। আমার আরো সংযম রক্ষা করা দরকার ছিল। আমি তাকে ধমক দিয়েছি-তোমার সাহস হল কীভাবে আমার কাছে তুমি ছুটি চাইতে এসেছ। তুমি না তোমার পরিবারকে বলবে যে, আপনারা বিয়েটা করে ফেলেন। বিয়ে ভেঙ্গে যাবে এটা খামাখা কথা। এটা কেমন কথা যে, ঐ ছেলে না থাকলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে? এটা হল অপ্রয়োজনীয় ...।

যাই হোক, বাবা, নিজের মর্যাদা নিজে বুঝতে চেষ্টা কর এবং নিজের মর্যাদা নিজে রক্ষা করতে চেষ্টা কর। অন্যকে বোঝাও আমাকে যদি কোনো অনুষ্ঠানে সঙ্গে রাখতে হয় তাহলে আমার ক্যালেন্ডার আছে। আমি কোনো ফালতু মানুষ নই। শুধু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই এ কথাটা বলতে পারে যে, আমার আলাদা

ক্যালেন্ডার আছে, আলাদা সময়সুচি আছে। তুমি সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তোমার পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বাকি সমাজ যেহেতু তোমাকে মর্যাদা দিচ্ছে না তাই নমনীয়তার সাথে অনমনীয় হও। বিরোধে যেও না। সমাজকে অনুমতি দিয়ে দাও যে, আমার অনুপস্থিতিতে সবকিছু করে ফেলতে পারেন। কিন্তু আমাকে থাকতে হবে-এটা ঠিক না। হ্যাঁ, কখনো কখনো তোমার এতে ক্ষতি হতে পারে। কখনো সুনামের ক্ষতি হতে পারে। ঐ ক্ষতিগুলোকে তুমি তোমার ইলমের যাকাত মনে করে আদায় কর, আর দেখ, আল্লাহ তাআলা কেমন উন্নতি দান করেন। হতে পারে, এই বিয়েতে শরিক না হওয়ার কারণে তোমার ভাই নারায হয়ে গেল। ঐ নারাযিকে তুমি কবুল করে নাও। বাকি ভাইয়ের সাথে ভ্রাতৃত্ব রক্ষা কর। ঐ নারাযি একদিন দূর হয়ে যাবে। আর যদি দূর না হয় তাহলে তুমি তোমার আজর পেয়ে যাবে।

আমাকে একজন বলেছিল যে, আমার ভাই তো আমার খরচ দেয়। আমি না গেলে আমার খরচ বন্ধ করে দিবে। আমি বললাম, ছিঃ। তুমি তালিবে ইলম, তোমার খরচ কে বন্ধ করবে? তোমার খরচ তো আসমান থেকে আল্লাহ তাআলা দেবেন। তুমি করে দেখ। ঠিকই সে বিয়েতে গেল না। কোনো সমস্যা হয়নি। শয়তানের ওয়াসওয়াসা। আর সমস্যা হলে আল্লাহ তাআলা নতুন রাস্তা খুলে দিবেন। আমি বলতে চাই যে,

কারোর মৃত্যুতেও আমার ছুটি না নেওয়া উচিত। ছুটি নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। এটা আমার কথা নয় আমার বড়দের কথা। তোমার দাদার ইন্তেকাল হয়েছে। তুমি এখান থেকে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড় এবং তার জন্য দুআ কর। সবাইকে নিয়ে দুআ কর। আমাদের এখানে এ রকম ঘটনা ঘটেছে। ছেলে যায়নি। আমরা সবাই মিলে তার জন্য দুআ করেছি। ঐ মরহুমের এখনো তো দুআ দরকার। তোমার উপস্থিতি তার দরকার নেই। তোমার উপস্থিতি তার হায়াত ফিরিয়ে আনবে না। কিন্তু তোমার ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ হয়ে যেতে পারে। এগুলো এখন কেউ বোঝে না। আমার কথাগুলি আমার কাছের মানুষও বোঝে না, দূরের মানুষও বোঝে না। আল্লাহর কাছে রাস্তার অভাব? যার জন্য সমুদ্রের তলদেশের মাছ দুআ করে তার রিযিক বন্ধ হবে কীভাবে? আর যদি এ রকমই হয় তাহলে মাদরাসা ছেড়ে দাও। ইলমওয়ালা যার দায়িত্ব নেবে না এমন ইলম পড়বে কেন?

মোটকথা, নিজের মর্যাদাকে কখনো ভূলুণ্ঠিত করবে না। ইলমকে, মাদরাসাকে মর্যাদা দাও। নমনীয়তার সঙ্গে অনমনীয়তা বজায় রাখ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। এ কথাটা যেন আর বারবার আমাকে না বলতে হয় বাবা! কিন্তু কী করব? কেউ যেন আমার কথা বোঝে না বলে মনে হয়।

ইলমে দ্বীন থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ..

এই যমানায় দ্বীন শেখার জন্য মাদরাসায় আসা বিরাট বড় কুরবানী। এত বড় কোরবানীর পর কোনো তালিবুল ইলমের মাহরূম হওয়ার কথা নয়। যে যমানায় দ্বীনী ইলমের কোনো কদর নেই, না পরিবারে, না সমাজে তখন যদি কোনো একজন মানুষ ইলমের জন্য আগ্রহী হয় এবং তা গ্রহণ করতে চায় তার তো মাহরূম হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অথচ বাস্তবতা এই যে, ইলমের তলবে এসেও অধিকাংশ মানুষ ইলম থেকে মাহরূম হয়ে যাচ্ছে। কী এর কারণ? কেন সে মাহরূম হচ্ছে? সে দুনিয়াও ছেড়ে দিল, আবার ইলম থেকেও মাহরূম হল। এর চে' মর্মান্তিক বিষয় আর কী হতে পারে? যে যমানায় সামান্য মেহনতের অনেক আজর দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে, তখন মানুষ কেন ইলম থেকে মাহরূম হয় তা চিন্তা করা দরকার। আমাদের পূর্ববর্তীগণ এর কারণগুলো সাফ সাফ বলে গিয়েছেন। এক দল তো মাহরূম হচ্ছে এই কারণে যে, তারা ইলম তলবই করেনি। তারা ইলম থেকে এমন মাহরূম হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়সের মানুষ এমন মাসআলা জিজ্ঞাসা করে, যা আমাদের মাদরাসার ছোট একজন তালিবুল ইলম শুনলেও হেসে দেবে। অথচ সেটিই তার কাছে বিরাট বিষয়। কারণ সে যিন্দেগীতে দ্বীনের একটি মাসআলাও শিখেনি। কিন' এই অল্প

ক’জন মানুষ, যাদের ইলম তলব করার সুযোগ হয়েছে তারা কেন মাহরূম হচ্ছে? এর কারণগুলো জানা দরকার এবং সেগুলো থেকে যথাসম্ভব নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কিছু কারণ এমন আছে, যেগুলোর উপর তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন গিযা (পানাহার) হালাল হওয়া। দ্বীনী ইলম হাসিল হওয়ার জন্য এটি একেবারে অপরিহার্য। অথচ তা তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণে নেই। তালিবুল ইলমের ভরণ-পোষণ যারা করে তাদের অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছে অথচ মাসআলা জানে না এবং জানার চেষ্টাও করে না। কোন কারবার হালাল, কোন কারবার হারাম, অনেকেরই তা জানা নেই। অনেকে তো জেনে শুনেও হারাম পন্থা অবলম্বন করছে। অনেকে বলে যে, এই যমানায় এত বাছ বিচার করে চলা সম্ভব নয়। তাহলে আর সংসার চালানো যাবে না। তবে আলহামদুলিল্লাহ, অনেক মানুষ এমনও আছে, যারা হালাল হারাম বেছে চলার জন্য আমাদের চেয়েও বেশি ফিকির করছে। তো কোনো অভিভাবক যদি হারাম পথে উপার্জিত অর্থ তালিবুল ইলমের পিছনে ব্যয় করে আর তালিবুল ইলম তা ভোগ করে এবং তা দিয়ে তার শরীরের রক্ত-মাংস তৈরি হয় তাহলে চিরতরে তার ইলমের দরজা বন্ধ। সারা জীবন মাদরাসায় পড়ে থাকলেও তার ইলম হাসিল হবে না। এজন্য তাকে খোঁজখবর নিয়ে জানতে হবে, অভিভাবকের উপার্জন হালাল কি না। হালাল বলে নিশ্চিত হলে সে তা ব্যবহার করবে। আর হারাম

হলে এর থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এর একটি ছুরত হল কোনোরকম জানটা বাঁচে-এ পরিমাণ গ্রহণ করা, এর বেশি গ্রহণ না করা। তারা দিতে চাইলেও তালিবে ইলমের কর্তব্য গ্রহণ না করা। কিন' আমাদের অনেক তালিবুল ইলমের অবস্থা তো এই যে, তার ভাই ও আত্মীয়-স্বজন হারাম উপার্জন করে, ব্যাংকে চাকরি করে, সুদি লেনদেন করে এ কথা জেনেও তাদের বাড়িতে বেড়াতে যায়, হারাম থেকে বাঁচার কোনো চেষ্টাই করে না। অথচ যারা হারাম উপার্জন করে বলে জানা আছে, তালিবুল ইলম তাদের বাড়িতে যেতে পারে না, তাদের বাড়ি থেকে কিছু খেতে পারে না। নতুবা ইলম থেকে মাহরূম হতে হবে। তবে আপনার উপার্জন হারাম, এই জন্য আপনারটা খাবো না-একথা বলার প্রয়োজন নেই। প্রথম কাজ নিজে হারাম থেকে বেঁচে থাকা। যেখানে যেখানে হারাম গিযার সামান্য গন্ধ আছে তালিবুল ইলমের উচিত সেখান থেকে দূরে থাকা। তবে এমনভাবে যাতে ফেতনা না হয়। তাদের বিয়ে-শাদীতে না যাওয়া, তাদের হাদিয়া-তোহফার বিষয়ে সাবধান থাকা, ফিরিয়ে দিলে যদি ফেতনা হয় তাহলে রেখে দিবে, কিন্তু নিজেরা খাবে না, অন্তত নিজে খাবে না। গরীবকে দিয়ে দিবে। বাবার উপার্জন হারাম হলে কোনো রকম জান বাঁচে-এ পরিমাণ গ্রহণ করবে। আর ইসতেগফার করে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে যে, আল্লাহ! আমার জন্য হালাল গিযার ব্যবস্থা করে দাও। আমার ইলমের পথের এই বাধা দূর করে দাও। আর যা উপায়হীন অবসস্থায়

গ্রহণ করছি আমার জন্য তা হালাল করে দাও। বাবার জন্য দোয়া করবে যে, আল্লাহ তুমি তাঁকে হারাম উপার্জন থেকে ফিরিয়ে আন এবং হালাল উপার্জনের তাওফীক দাও। এভাবে ভিতরে যদি তড়প ও অস্থিরতা আসে তাহলে আল্লাহ তাআলা অন্তত তার জন্য ঐ গিযাটা হালাল করে দিবেন। তারপর মা বাবাকে জানানো দরকার যে, সন্তানের ইলমের জন্য পিতামাতার হালাল-হারাম বেছে চলা জরুরি। যে ঘরের উপার্জন হালাল নয় সে ঘরে ইলম আসে না। সন্তানকে মাদরাসায় দিলেও তার যিন্দেগী কামিয়াব হয় না। না দুনিয়াতে, না আখিরাতে। বহু ছেলে এভাবে বরবাদ হচ্ছে। কেউ কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা করছে না। আমার মনে হয়, এর মূল কারণ হল, হারাম গিযা। থানভী রাহ. বলেছেন মাদরাসায় কোনো তালিবুল ইলমকে দাখেল করার সময় খবর নাও যে, অভিভাবকের উপার্জন হালাল কি না। আমরা তো খবর নেই না, এমনকি এই প্রশ্নটাও করি না যে, আপনি কী চাকরি করেন, আপনার আয় কত? আপনার অন্যান্য উপার্জন কী? আমি একটা ভর্তি ফরম তৈরি করেছিলাম যাতে এই সব প্রশ্ন ছিল। কিন্তু তা চালু করতে পারিনি। আমার সঙ্গীরা বলল, এতে ফেতনা হবে। কিন্তু কী লাভ হয়েছে! যারা মাহরূম হওয়ার তারা তো মাহরূম হচ্ছেই। অনেক ছেলেকে দেখি, সুন্দর লেখাপড়া করছে, হঠাৎ বলে যে, আমার লেখাপড়া করতে মন চায় না। পালিয়ে যায়। কোনো মারধর করা হয় না। আদর আপ্যায়নের

সাথে পড়ানো হয়। পালিয়ে যাওয়ার বাহ্যিক কোনো কারণ নেই। তবুও পালিয়ে যায়। আমরা এর কারণ তলিয়ে দেখি না। এর প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল হারাম গিযা। এই হারাম গিযা থেকে তালিবুল ইলমের বাঁচার উপায় হল একেবারে যতটুকু না নিলে নয়, ততটুকু নেবে। অতিরিক্ত নেবে না। দিতে চাইলেও এই বলে ফিরিয়ে দেবে যে, আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখন ফিরিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, জোর করে আরো বেশি আদায় করার চেষ্টা করে। অথচ এই অতিরিক্ত খরচটা তার ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ। এটা খুব নাযুক এবং স্পর্শকাতর বিষয়, কিন' না বলে তো উপায় নেই। অভিভাবকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে কথা হয় তাদেরকে বলা দরকার যে, আপনার উপার্জন হালাল করার চেষ্টা করুন। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে ছেলেকে মাদরাসায় দেবেন না। দিলে ছেলের ইলম শিক্ষা হবে না। দুনিয়াও বরবাদ হবে, আখেরাতও বরবাদ হবে। কাবা ঘর নির্মাণের সময় কাফের-মুশরিকরা পর্যন্ত হালাল উপার্জন দ্বারা আল্লাহর ঘর নির্মাণ করার চেষ্টা করেছে। তারা ভেবেছিল আল্লাহর ঘর নির্মাণের সময় হারাম মাল ব্যবহার করলে আল্লাহর কাছে রেহাই পাব না। হালাল উপার্জন দ্বারা নির্মাণের চেষ্টা করেছিল বলেই একটি অংশ তারা নির্মাণ করতে পারেনি, ছোট করে নির্মাণ করতে হয়েছে। এখন মুসলমানদের দেশে সরকারী পয়সা ব্যয় করে স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি তৈরি

হচ্ছে। সরকারী পয়সায় হালাল হারামের কোনো বাছ-বিচার নেই। প্রকাশ্যে হারাম রাজস্ব সরকারী তহবিলে জমা হচ্ছে। সুতরাং ঐ সকল স্থান থেকে যারা লেখাপড়া করে বের হবে তারা কিছু শব্দ ও বাক্য শিখতে পারে, কিন্তু মানুষ হতে পারে না। কাফেরদের দেশে হবে, কিন' মুসলমানদের সন্তান হারাম পয়সায় লেখাপড়া করে মানুষ হবে না। এই জন্য মাদারেসে কাওমিয়্যা সব সময় সরকারী সাহায্য থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখছে। একইভাবে ব্যক্তিগতভাবে যাদের ঘরে হারাম উপার্জন হয় তাদের ঘরে ইলম আসার কথা নয়। হাঁ, ঘরে হারাম উপার্জন হওয়া সত্ত্বেও তালিবুল ইলম যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা হিফাযত করবেন। বেঁচে থাকার উপায় কী? যতটুকু না খেলে আমি বাঁচতে পারব না, যতটুকু কাপড় না হলে আমার সতর ঢাকবে না, এ পরিমাণ নেওয়া, এর বেশি না নেওয়া। আর হারাম উপার্জনকারী আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে না খাওয়া এবং তাদের হাদিয়া গ্রহণ না করা। ইলম থেকে মাহরূমীর দ্বিতীয় কারণ হল বাড়িতে আল্লাহর নাফরমানী হওয়া। যে বাড়িতে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী হয়, নাচ গান হয়, পর্দা-পুশিদা নেই, মা পর্দা করে না, বোন পর্দা করে না, বাবা পর্দা করে না সে বাড়িতে ইলম আসবে না। এগুলোর উপর যদিও তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই তবুও এগুলো তার ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার অনেক বড় কারণ। এটা থেকে সে বাঁচবে কীভাবে? সে

নিজে পর্দা করবে। এই মাদরাসার একজন তালিবুল ইলমকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভাবী আছে? সে বলল, আছে। ভাবীর সাথে দেখা দাও? বলল, জ্বী। ভাবীর সাথে পর্দা করা যে জরুরি তাকি জানো? বলল, না। তোমার আব্বা কোথায়? বলল, হজ্বে গেছেন। হজ্ব থেকে আসলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবে। তার পিতা এলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি ঘরে ভাবীর সাথে পর্দা করে? তিনি বলেন কি, এক ছাদের নিচে থাকলে পর্দা করা কি সম্ভব? আমি বললাম, আপনি যদি ঘরে পর্দা রক্ষা করতে না পারেন তাহলে আপনার ছেলের ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার আশঙ্কা আছে। কোনো গুরুত্ব দিল না। এমনকি ছেলেটাও না। এরপর বছরখানেকের মধ্যেই লেখাপড়া থেকে তার মন উঠে গেল। সে আর পড়ল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়িতে পর্দা না থাকার কারণে ছেলেটা ইলম থেকে মাহরূম হল। এজন্য তালিবুল ইলমের বাবা-মার উচিত পর্দা করা, তালিবুল ইলম চেষ্টা করে যদি বাড়িতে পর্দা না আনতে পারে তাহলে অন্তত নিজের পর্দাটা রক্ষা করা কর্তব্য। যাদের সাথে পর্দা করা জরুরি সে যদি তাদের সাথে পর্দা করে তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাকে ইলম দান করবেন, তাকে মাহরূম করবেন না। বাড়িতে নাচগানের ব্যবস্থা আছে কিন' সে ঐগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিবেন। আর এখন তো তালিবুল ইলম-আল্লাহ তাআলা হিফাযত করুন-নিজেই মাদরাসায় নাচগানের ব্যবস্থা

করে নেয়। মাদরাসায় যন্ত্র নিয়ে আসে! ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে? যার মা বাবা বাড়িতে নাচগানের ব্যবস্থা করে ঐ ছেলের ইলম হাসিলের কোনো সম্ভাবনা নেই, তার মাহরূম হওয়া নিশ্চিত। আল্লাহ তাআলা যদি তাঁর দ্বীনকে হিফাযত করতে চান তাহলে ঐ ছেলেকে আলিম বানাবেন না। কোনো না কোনো ভাবে সে ইলম থেকে মাহরূম হয়েই যাবে। আজ হোক কিংবা আগামী কাল। এখন বাঁচার একমাত্র উপায় হল ঐগুলোকে অন্তর থেকে ঘৃণা করা এবং তাতে শরীক না হওয়া। তাহলে আল্লাহ মেহেরবানী করে তাকে ইলম দিয়ে দিবেন। মোটকথা, প্রতিকূল পরিসি'তিতেও তালিবুল ইলম যদি হারাম গিযা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, পর্দার উপর পুরা মযবুতীর সঙ্গে আমল করে এবং নাচগান ইত্যাদি গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে ইলম দান করবেন। এ ধরনের আরো কিছু কারণ আছে, যেগুলোর উপর তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই, কিন্তু সেগুলো থেকে বাঁচার উপায় আল্লাহ তাআলা রেখেছেন। পক্ষান্তরে কিছু কারণ আছে যেগুলোর উপর তালিবুল ইলমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে, কিন্তু তালিবুল ইলম তা থেকে বেঁচে থাকে না। এটা তো আরও মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলমের পথের সকল বাধা থেকে বেঁচে থাকার এবং ইলম হাসিল হওয়ার যাবতীয় আসবাব ইখতিয়ার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইলমের পিপাসা ও পরিচর্যা : মুফতী ফয়যুল্লাহ রাহ.-এর দুই মেয়ে

মাসুমা সাদিয়া

মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী ফয়যুল্লাহ রাহ.-এর কয়েকজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে দুই মেয়ে বেঁচে ছিল। বড় মেয়ের নাম রাহীমা খাতুন। ছোট মেয়ের নাম যায়নাব খাতুন।

আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। তাদের ইলম অর্জনের আগ্রহের কথা শুনলে অবাক হতে হয়। অতি অল্প বয়সেই তারা যেসমস্ত কিতাব পড়ে ফেলেছেন, শুনলে অবাস্তব মনে হয়।

পিতা নিজেই তাঁদের অনেক প্রশংসা করতেন। বড় মেয়ে সম্পর্কে বলেন, আমার কলিজার টুকরা মেয়েটি যদি পুরুষ হত তাহলে মাশাআল্লাহ অনেক বড় আলেম হত। কিংবা বিবাহটাও যদি কিছু দেরিতে হত তাহলে ফাযেলা বনে যেত। কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা, চৌদ্দ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তার বিবাহ হয়ে গেল এবং সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এভাবে বিভিন্ন সময় উভয় মেয়ের কথা বলতেন।

বড় মেয়ে সম্পর্কে হযরত মুফতী ছাহেব নিজেই বলেন তার জেহেন-মেধা এবং কিতাবাদী বুঝার ও মুখস্ত করার যোগ্যতা প্রখর ছিল। অত্যন্ত বুঝমান এবং মেধাবী ছিল। কিতাবের যত কঠিন বিষয় হোক অত্যন্ত পরিপূর্ণতার সাথে উপস্থাপন করতে পারতো। ইবারাতের স্বাভাবিক অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন। সবক শুনাতে অথবা সামনের পড়া পড়তে ইবারত (আরবী পাঠ) খুব দ্রæততার সাথে পড়তে পারত। নির্ভুল পড়ত। হস্তাক্ষর ছিল পরিষ্কার ও সুন্দর। যে কোনো বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরতে পারত।

মুফতীয়ে আযম রাহ. বলেন, অনেক সময় আমি তাকে দিয়ে ফতোওয়াও নকল করিয়েছি। ফারায়েয ও (মিরাছ বণ্টন-হিসাব) করিয়েছি। মাশাআল্লাহ ফারায়েযে সে খুবই দক্ষ ছিল।

মুহতারামা রহীমা খাতুন তার নিজের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে বলেন, আমাদেরকে পড়ানোর ক্ষেত্রে আব্বাজান রাহ.-এর সীমাহীন আগ্রহ ছিল। আল্লাহ তাআলার অসীম মেহেরবানী তিনি আমাদেরকেও দ্বিনী ইলম অর্জন করার সীমাহীন আগ্রহ দান করেছেন। আব্বাজান রাহ. আমাদেরকে যত্নের সাথে পড়াতেন। আমি, ছোট বোন যায়নাব এবং ঘরের অন্যান্য বাচ্চাদেরকে পড়ানোর জন্য উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা আযীযুল্লাহ

ছাহেব রাহ.-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। আমি দশ বছর বয়সেই সম্মানিত উস্তাযের কাছে উর্দু-ফার্সীর প্রাথমিক কিতাবগুলো এবং ইলমে ছরফের মীযান-মুনশাইব, পাঞ্জেগাঞ্জ এবং ইলমে নাহুর নাহবেমীর পরিপূর্ণরূপে শিখে ফেললাম। তিনি আরো বলেন, আমি এই কিতাবগুলো যতটুকু পড়েছি যায়নাবও আমার চেয়ে ছোট হওয়া সত্ত্বেও উস্তাদজীর কাছে ততটুকু পড়েছে। তবে যায়নাব ইলমে ছরফে অনেক পাকা ছিল। কোনো ছীগা জিজ্ঞাসা করলে সাথে সাথে বলে দিতে পারত। যায়নাবের দক্ষতা সম্পর্কে আব্বাজান রাহ. বলেন, একবার আমার দোস্ত মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মাজীদ শাহ ছাহেব রাহ. এবং মাওলানা আবুল হাসান রাহ. ও মাওলানা নূর আহমদ ছাহেব রাহ. আমাদের ঘরে এলেন। খানাপিনা থেকে ফারেগ হওয়ার পর যায়নাবকে আমার রচিত 'তালীমুল মুবতাদী' থেকে কিছু প্রশ্ন করলেন। যায়নাবের বয়স ছিল তখন খুবই কম। কিন্তু মাশাআল্লাহ সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। তখন শাহ ছাহেব রাহ. খুব খুশি হলেন এবং তাকে পুরস্কার দিলেন।

মুফতীয়ে আযম রাহ. বলেন, 'তালীমুল মুবতাদী' রচনা করার প্রেক্ষাপট ছিল; আদরের কন্যা যায়নাবের আরবী সাহিত্যের সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্য কিছু জুমলা আরবীতে লিখিয়ে দিতাম। এভাবে কিছু লেখা একত্রিত হয়ে একটা কিতাবের আকার ধারণ করে।

মুহতারামা রহীমা খাতুন আরো বলেন, দশ বসর বয়সেই নাহবেমীর পর্যন্ত পড়ার পর পড়াশোনার আগ্রহ আরো বাড়তে থাকল। আব্বাজান রাহ.-এর ইচ্ছাও এটাই ছিল যে, উস্তাদজীর কাছে প্রচলিত সমস্ত কিতাবই পড়ব। পরে যখন উস্তাদজীর কাছে যেতে লজ্জাবোধ করতে শুরু করলাম তখন আব্বাজান নিজেই ঘরের মধ্যে খুব গুরুত্বের সাথে পড়ানো শুরু করলেন। ফজর এবং জোহর নামাযের পরে এবং রাতে পড়াতেন। উস্তাদজীর কাছে পড়া কিতাবগুলো ছাড়াও আব্বাজান প্রথমেই কারীমা, পান্দেনামা আত্তার, গুলিস্তা, বোস্তা এবং ফার্সী কিতাবগুলোর পাশাপাশি আরবী মুফীদুত তালেবীন, তালীমুল মুতাআল্লিম, কালয়ূবী, কাসীদাহ বুরদাহ, নাফহাতুল আরব এবং আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ রাহ.-এর প্রসিদ্ধ কিতাব আলফুরকান ইত্যাদি পড়ালেন। ফিকহের মধ্যে মা-লা-বুদ্দামিনহু, কুদুরী এবং আব্বাজান রাহ.-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ আরবী ও ফার্সিও পড়ালেন।

আমার বয়স যখন তের বসর তখন আব্বাজান রাহ. আমাকে উলূমে আরাবিয়্যাহ এবং ফিকহের সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্য হেদায়া পড়াতে শুরু করলেন। আব্বাজান রাহ. হেদায়া শুরু করার পর আমি অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সাথে পড়তে

লাগলাম। হেদায়ার পাশাপাশি আরো দুতিনটি বিষয়ের দু'তিন কিতাবও পড়লাম।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি রাত-দিন মুতালাআয় ডুবে থাকতাম। আমার পড়াশোনার জন্য আলাদা একটা কামরা ছিল। পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে বিধায় আম্মার সাথে থাকার পরিবর্তে ঐ কামরায় থাকতাম এবং রাতেও সেখানে থাকতাম। কোনো কোনো সময় এমন হতো যে, যথেষ্ট পরিমাণ রাত জাগার পর আব্বাজান রাহ. এসে শুয়ে যাওয়ার নির্দেশ করতেন। আব্বাজানের কথা অনুযায়ী বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়তাম। কখনো আবার এই কৌশল করতাম যে, 'হারিকেনের চিমনী কাগজ দিয়ে ঢেকে দিতাম' যেন তিনি মনে করেন আমি শুয়ে পড়েছি।

হযরত মুফতী ছাহেব রাহ. একবার হাটহাজারীর জামে মাসজিদে তাঁর বুধবারের বয়ানে বলেন, যেদিন মেয়ে রহীমা খাতুন তাফসীরে জালালাইন শুরু করল ঐদিনের কথা, আমি রাতের যথেষ্ট অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর কোনো প্রয়োজনে ঘুম থেকে জাগ্রত হলাম। দেখতে পেলাম রাহীমার ঘরে বাতি জ্বলছে। এত রাতে তার ঘরে আলো দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। চুপি চুপি তার কামরার কাছে গেলাম। দেখলাম, সে জালালাইন

শরীফের মুতালাআয় ডুবে আছে। এটা দেখে আমার আর খুশীর সীমা রইল না। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম।

বড় মেয়ে রহীমা খাতুন বলেন, হেদায়া শুরু করার পর নিয়মিত পড়তে থাকলাম এবং অল্প দিনেই হেদায়ার প্রথম দু’খণ্ড শেষ হয়ে গেল। তখন আব্বাজান রাহ. আবার পড়াতে শুরু করলেন। পাশাপাশি মিশকাত শরীফ-এরও ছবক দিলেন। মিশকাত শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দে শব্দে পড়ালেন এবং শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. রচিত أشعة اللمعات (মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) পূর্ণ চার খণ্ড সমাপ্ত করালেন।

মিশকাত শরীফ أشعة اللمعات সহ যখন সমাপ্ত হল তখন আমার চৌদ্দ বছর পূর্ণ হল। আবার যখন মিশকাত শরীফ পুনরায় পড়তে শুরু করলাম তখন হেদায়া আখেরাইন (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) এবং জালালাইন শরীফ সবক দিলেন। আর তখনি আমার বিবাহ হয়ে গেল।

আলহামদু লিল্লাহ বিবাহের পূর্বেই এ সমস্ত কিতাবাদি পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেল।

তিনি আরো বলেন, ইলম অর্জনের যে তীব্র আকাংখা ছিল বিবাহের পর তাতে ভাটা পড়ল। কুতুবে সিত্তা (ছিহাহ ছিত্তা) খতম করার যে তামান্না অন্তরে ছিল সেটাও পূর্ণ হল না। এজন্য যদি জীবনের শেষ পর্যন্তও আফসোস করি তা কমই হবে।

এখন শুধু কবির এ কথায় সান্তনা খুঁজি- 'মানুষ যা কামনা করে তার সবটাই সে পায় না / বাতাস জাহাজের বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়'।

অবশ্য বিবাহের পরে মুয়াত্তা মুহাম্মাদ এবং সীরাজী পড়েছি।

মুফতীয়ে আযম রাহ. বলেন, রাহীমার ফারায়েযের ক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা ছিল, কিন্তু বিবাহের পরে ঘরের ঝামেলা এবং বিভিন্ন সমস্যার কারণে নিবিড়ভাবে পড়াশোনার সুযোগ সে পায়নি। এর মাঝেই যতটুকু সম্ভব হয়েছে চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

মুহতারামা রহীমা খাতুন আরো বলেন, ছোট বোন যায়নাব উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা আযীযুল্লাহ ছাহেবের কাছে নাহবেমীর পর্যন্ত পড়ার পর আব্বাজান রাহ. 'তালীমুল মুবতাদী', 'ফয়যুল কালাম' 'হিদায়াতুল ইবাদ' ইত্যাদি কিতাব পড়ালেন। ইন্তেকালের আট-নয় বছর পূর্বে আব্বাজান রাহ. আমাদের দু'বোনকে কুরআনের তরজমা জরুরি তাফসীরসহ

পড়িয়ে দিলেন। আমার তো কিছু কারণে কখনো কখনো অনুপস্থিতি হয়ে যেত। কিন্তু ছোট বোন যায়নাব ঠিকই আব্বাজানের কুরআনের দরস দ্বারা উপকৃত হতে থাকল। আব্বাজান রাহ. আমাদেরকে যে পরিমাণ ভালবাসতেন, তা প্রকাশ করার ভাষা আমাদের নেই। আম্মাজান রাহ. বলেন, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম আব্বাজান রাহ. কোথাও গেলে ঘরে এসে প্রথমেই আমাকে কোলে নিতেন। আমাদের খোঁজখবর নিতেন। আর সবচেয়ে বড় ভালবাসা হল তিনি আমাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখিয়েছেন। যার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না।

আখলাক-চরিত্র : বড় মেয়ের আখলাক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এক দৃষ্টান্তহীন নারী ছিলেন তিনি। তার স্বভাব-চরিত্র ছিল প্রশংসার যোগ্য। আল্লাহ তাআলা মুফতীয়ে আযম রাহ.-কে যে সমস্ত বিরল গুণ এবং নমুনাহীন চরিত্র দান করেছেন তার সবটাই তিনি পেয়েছিলেন। আচার আচরণ, চলা-ফেরা, অভ্যাস-রীতি মোটকথা জিন্দেগীর সর্বক্ষেত্রে সম্মানিত পিতার অবিকল প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

ছোট মেয়ে যায়নাব সম্পর্কে জীবনীকার বলেন, তিনি আমার খালা-শাশুড়ি ছিলেন। সাত বছর আমি তাদের বাড়িতে রাত-দিন অবস্থান করেছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর গলার

আওয়াজ কখনো আমার কানে আসেনি। অথচ মাঝখানে শুধু বাঁশের বেড়া ছিল।

তার লজ্জা এতই প্রবল ছিল। এগার বছর পর্যন্ত তার সাথে আমার একটি কথাও হয়নি। কয়েক বসর আগে হযরতের জীবনের কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তার বড়বোনের মাধ্যমে অনেক পীড়াপীড়ি করলাম; নিজের পিতার কিছু কথা আমাদেরকে শুনান, কিন্তু লজ্জার দরুণ তার মুখ থেকে এক শব্দও বের হয়নি।

শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রেই নয়, হযরত মুফতী ছাহেব স্বীয় স্ত্রীর পড়াশোনার ক্ষেত্রেও বেশ সজাগ ছিলেন এবং এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিতেন। স্ত্রীর তালীমি বিষয়ে হযরত রাহ. নিজেই বলেন, তিনি যখন খুবই ছোট তখন আমি মকতবে কিছু বাচ্চাদের পড়াতাম। তার মধ্যে আমার আহলিয়াও ছিল। বিবাহের আগে কায়েদা থেকে কুরআন শরীফ পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছি। অবশ্য বিবাহের পরে উর্দু কিতাব যেমন, রাহে নাজাত, যীনাতুন নিসা, হুকুকুল ইসলাম, মিফতাহুল জান্নাত, বেহেশতী জেওর এগার খণ্ড এবং ফার্সী পহলী ইত্যাদি কিতাবগুলো পড়িয়েছি। আরবীর সাথে সম্পর্ক তৈরি করানোর জন্যে 'মুফীদুত তালেবীন' শুরু করেছি, কিন্তু ঘরোয়া বিভিন্ন ঝামেলা ও বিভিন্ন অসুস্থতার কারণে আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। অন্যথায় ইচ্ছা ছিল মেয়েদের

মত একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পড়াব। তারপর মাদরাসার দরসের ফাঁকে ফাঁকে কিছু পড়াতাম।

[তথ্যসূত্র: হায়াতে মুফতী আযম রাহ. (উর্দূ), লেখক মাওলানা মুফতী ইযহারুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম]

এসবকিছু লেখার এই উদ্দেশ্য নয় যে, আমরা একজন আরেকজনের কাছে বলব আর তৃপ্তি পাব। বরং উদ্দেশ্য হল, উপদেশ গ্রহণ করা এবং তাঁদের উত্তম অবস্থাগুলো নিজের চলার পথের মশাল বানানো। হযরত রাহ.-এর পরিবারস্থ নারীরা আমাদের জন্য আদর্শ, নারী জাতির মাঝে অনন্য দৃষ্টান্ত।

তিনি তাদেরকে আরবী, ফার্সী, উর্দু, কুরআনের তাফসীর, ফিকহ কোনোটাই শিক্ষা দিতে বাদ রাখেননি।

নারী জাতির কত ঝামেলা-অজুহাত, একটু চিন্তা করি; তারাও তো আমাদের মতই নারী। অত কম বয়সে এতগুলো কিতাব পড়ে ফেলা খুব বেশি আগের কথাও নয়। তারা তো আমাদের দেশেরই নারী। আজ আমাদের মাঝে দ্বীন শিক্ষার আগ্রহ খুবই কম। সাংসারিক ঝামেলায় পড়ে গেলে তো আর কথাই নেই। যদি একটু ভেবে দেখি তাহলে তাঁদের জীবন কাহিনীতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক রয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে একটু ভেবে দেখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কুরআন-সুন্নাহর ইলম কেন কল্যাণময়

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ

কুরআন মাজীদের একটি বিখ্যাত আয়াত-

يُّؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ .

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিকমাহ দান করেন। আর যে হিকমাহ প্রাপ্ত হয়েছে সে তো প্রভুত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে। -সূরা বাকারা (২) : ২৬৯

কুরআনে কারীমের প্রতিটি ইলম, প্রতিটি বিষয় কল্যাণ। কুরআনে কারীমের যে কোনো বিষয়ের উপর আমলের তাওফীকও কল্যাণ। কুরআনে কারীমের এক একটি অংশ যে অর্জন করে সে কল্যাণের এক একটি অংশ অর্জন করে। কুরআনে কারীমের এক একটি বিধানের উপর আমলের সৌভাগ্য যে অর্জন করে, সে খাইর ও কল্যাণের এক একটি বড় অংশ অর্জন করে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিখ্যাত হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

আল্লাহ তাআলা যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের গভীর ইলম, গভীর প্রজ্ঞা দান করেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

তাহলে দ্বীনের ইলম, দ্বীনের প্রজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে অনেক বড় নিআমত। যাকে তিনি কল্যাণ দান করতে চান তাকে এই নিআমত দান করেন।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। দুনিয়াতেও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, আখিরাতেও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না।

ما شاءَ الله كانَ، وما لم يشَأْ لم يكُن.

আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। তো হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের কল্যাণ-ইচ্ছার একটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন যে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের গভীর ইলম, গভীর প্রজ্ঞা, দান করেন। সে দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে, দ্বীনের বিধান অনুযায়ী চলতে পারে। আর এভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ অর্জন করে।

কুরআন ও সুন্নাহয় হিকমাকে খাইর বলে অভিহিত করা হয়েছে; বরং খাইরে কাছীর প্রভ,ত কল্যাণ বিশেষণে উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য কী? তাৎপর্য হল বান্দা যেন, এ 'খাইরে কাছীর' অর্জনে উৎসাহিত হয়। খাইর বলে জানবে কিন্তু তা অর্জনে সচেষ্ট হবে না- তা তো হতে পারে না। যার বিচার-বুদ্ধি আছে, কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রতি বিশ্বাস আছে, যে নিজের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ চায়, সে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে জানবে যে, এই বিষয়টি খাইর, এটি কল্যাণ, তখন অবশ্যই তা অর্জনে সচেষ্ট হবে।

তো কুরআন ও সুন্নাহয় এই কল্যাণ অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। মানুষ যেন নিজেও এই কল্যাণ অর্জন করে এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবার জন্য এই কল্যাণের চিন্তা-ভাবনা করে।

এখানে একথাটিও বুঝতে হবে যে, কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম হচ্ছে এমন কল্যাণ, যা অর্জন করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। এটা নিছক মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক পর্যায়ের বিষয় নয়। ইচ্ছে হয় অর্জন করলাম, ইচ্ছে হল না অর্জন করলাম না- এমন বিষয় নয়; বরং এটা এমন খাইর, যার বিপরীত 'শার'। এমন কল্যাণ, যার বিপরীতে অকল্যাণ। এমন কল্যাণ, যার বিপরীতে ধ্বংস। এমন কল্যাণ, যা মানুষের মুক্তি ও সাফল্যের পথ। সুতরাং এটা ঐচ্ছিক কল্যাণ নয়; বরং এমন কল্যাণ, যা অর্জন করতেই হবে।

নিজেও অর্জন করতে হবে, নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী সকল মুসলিমের জন্য এই কল্যাণের শুভ কামনা অন্তরে পোষণ করতে হবে।

কুরআনে কারীমের সূরাতুত তাহরীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা অতি হৃদয়গ্রাহী আঙ্গিকে ইরশাদ করেছেন-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা রক্ষা কর নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে।

কীসের থেকে রক্ষা করবে? 'نَارًا'-ঐ আগুন থেকে, ঐ জাহান্নাম থেকে وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ -সেই জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতাগণ। لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ-যারা আল্লাহ তাআলার কৃত আদেশের অন্যথা করেন না। وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ-এবং তাদের যে আদেশ করা হবে তা-ই তারা করবেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আখিরাতের সেই কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করার আদেশ করেছেন। কাকে রক্ষা করার? اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ-নিজেকে রক্ষা করার এবং পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার।

রক্ষা করার উপায় কী? প্রকৃতপক্ষে রক্ষা তো করবেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ ছাড়া রক্ষাকারী কেউ নেই। এখানে যে আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর-একথার মানে কী? মানে হল তোমরা নিজেদেরকে ও পরিবার-

পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার উপায় অবলম্বন কর। নিজেরাও জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন কর, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততিও যেন জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন কর। সেই উপায় কী?

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

اعْمَلُوا بِطَاعَةِ اللهِ، وَاتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ، ومُروا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ، يُنْجِيكُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ তোমরা নিজেরাও আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদারি করো, নাফরমানী থেকে বেঁচে থেকো আর পরিবার-পরিজনকেও স্মরণ রাখার আদেশ করো তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবেন। তাফসীরে ইবনে কাছীর সহীহ বুখারীর এক দীর্ঘ ঘটনায় আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কিছু যুবক সাহাবীকে যারা বেশ কিছু দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে থেকে ইলম অর্জন করেছেন, তাদের উপদেশ দিয়েছেন যে,

ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ.

পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং ওদের মধ্যে অবস্থান করো আর-

عَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُم.

তাদেরকে শেখাও এবং আদেশ কর। দুটো বাক্য, দুটো কথা। কিন্তু অনেক কথা এই দুই কথার মধ্যে আছে। عَلِّمُوْهُمْ- তাদেরকে শেখাও।

কী শেখাবে? তাদেরকে ইসলাম শেখাও, দ্বীন শেখাও। আকীদা শেখাও, আমল শেখাও। তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে সচেতন কর। হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতন কর। এটা হল শেখানোর পর্যায়।

এর পরের পর্যায় হল আদেশ কর। শুধু শেখানো নয়, শুধু শেখানোর দ্বারাই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না; বরং 'مُرُوْهُمْ' যা শেখানো হল সেই অনুযায়ী আমলের আদেশ কর। তাদেরকে পরিচালিত কর। তো কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলম শেখা ও শেখানো, সহীহ আকীদা, সহীহ আমল শেখা ও শেখানো, হালাল-হারামের বিধান শেখা ও শেখানো এবং সেই মোতাবেক নিজের ও

সংশ্লিষ্টদের পরিচালিত করার চেষ্টা করা- এটা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষার এবং সংশ্লিষ্টজনদের রক্ষা করার উপায়।

এই আদেশ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে দান করেছেন।

কাদেরকে দান করেছেন? যারা মুমিন তাদেরকে। يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করেছেন। ঈমানদাররা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ মোতাবেক চলতে হবে। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে হাজির হতে হবে। বিশ্বাস করে যে, দুনিয়াতে মানুষের কর্মের ফল আখিরাতে পেতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। এক দল জান্নাতী হবে, এক দল জাহান্নামী। এই বিষয়টি তারা বিশ্বাস করে। কাজেই মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তোমরা সত্যে বিশ্বাস করেছ, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আমল কর-

তাহলে মুমিনকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। হয় সে আলিম হবে অথবা মুতাআল্লিম। দ্বীনের জ্ঞানী হবে, কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রজ্ঞাবান আলিম হবে অথবা কুরআন-সুন্নাহ্র ছাত্র হবে অথবা কুরআন সুন্নাহ্র ইলমের শ্রোতা হবে, মনযোগের সাথে, আন্তরিকতার সাথে গ্রহণের নিয়তে কুরআন-সুন্নাহ্র বিধি-বিধান

শুনতে থাকবে। এর বাইরে- চতুর্থ প্রকারের লোক, না আলেম, না ছাত্র, না কুরআন-সুন্নাহ্র কথা শুনে সেই মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করে- কোনোটাই নয়; বরং চতুর্থ প্রকারের। অর্থাৎ জাহিল। এই চতুর্থ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত কিছুতেই হবে না। তাহলে তো ধ্বংস হতে হবে। দুনিয়ার জীবন ধ্বংসও হবে আখিরাতের জীবনও ধ্বংস হবে।

ধ্বংস থেকে যদি বাঁচতে হয় সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী গোটা মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংসের পথ থেকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে এর উপায়, কুরআন-সুন্নাহ্র ছাত্র হওয়া। কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা। তাহলে কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলম, যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'খাইর' বলেছেন, এটা এমন খাইর, এমন কল্যাণ, যার বিপরীত হল শার, অনিষ্ট-অকল্যাণ-ধ্বংস। এই কল্যাণ আমাদের অর্জন করতেই হবে।

কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের কী শেখায়? কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে শেখায়- আমাদের বিশ্বাস কী হবে, আমাদের চিন্তা-চেতনা কেমন হবে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে শেখায়- আমাদের ইবাদত-বন্দেগী কী হবে, তার পদ্ধতি কী হবে। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শেখায়- আমাদের লেন-দেন কেমন হবে, কোন পদ্ধতিতে হবে। উপার্জনের কোন্ পদ্ধতি হালাল,

আর কোন্টি হারাম। কুরআন-সুন্নাহ আমাদের শেখায়- আমাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার কেমন হবে। আল্লাহর হক কীভাবে আদায় করা হবে, বান্দার হক কীভাবে আদায় করা হবে। আল্লাকে কীভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে আর বান্দার সাথে কীভাবে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

কাজেই ভালো ও সজ্জন হতে হলে কুরআন-সুন্নাহ্র ইলমের কোনো বিকল্প নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে 'খাইরে কাছীর'-প্রভুত কল্যাণ উন্মুক্ত করেছেন। এই ইলমের মাধ্যমে মানুষের জীবনের সকল অঙ্গন আলোকিত হয়। আকীদা-বিশ্বাস থেকে শুরু করে ইবাদত-বন্দেগী, লেন দেন, আচার-ব্যবহার সবকিছু সুন্দর হয়।

দেখুন, আকীদা, ইবাদত এই পর্যন্ত তো সহজেই বুঝে আসে। কারণ সহীহ আকীদা মানুষ জানতেই পারবে না, যদি কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম অর্জন না করে। তার সঠিক বিশ্বাস কী হবে, আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস এবং চারপাশের জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস, মানুষের সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে বিশ্বাস। মানুষ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাবে, এ সম্পর্কে সঠিক বিশ্বাস

অর্জনই করতে পারবে না, যদি কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলমের শরণাপন্ন না হয়।

ইবাদতের বিষয়টাও বুঝে আসে। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইবাদত সঠিক পন্থায় যদি করতে হয় তাহলে আমাকে শিখতে হবে, জানতে হবে। নামাযের নিয়ম শিখতে হবে, যাকাতের নিয়ম শিখতে হবে, সওমের নিয়ম শিখতে হবে, হজে¦র নিয়ম শিখতে হবে।

লেন-দেন সম্পর্কেও বুঝে আসে। কোন্ মুসলিম না জানে যে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধান আছে। বেচা-কেনা হালাল, রিবা হারাম। এটা সকল মুসলিম জানে। তো প্রত্যেক মুসলিম মৌলিকভাবে জানে যে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধান রয়েছে। হালাল মোতাবেক চলতে হলে জানতে হবে। হারাম থেকে বাঁচতে হলে জানতে হবে।

বাকি স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ- এই পর্যায়ে এসে অনেকের ভুল হয়ে যায়। পশ্চিমা শিক্ষাদর্শনের প্রভাবে মানুষের মনে এই চেতনা অনেক সময় জাগে যে, ভালো মানুষ তো সে, যার আচার-ব্যবহার ভালো। মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলে। মানুষের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। নিজের স্বার্থের উপরে অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। দুঃখ-দুর্দশায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের কিছু ভালো স্বভাব, কিছু ভালো আচরণকেই মানুষ ভালোর মানদÐ মনে করে এবং ভালো মানুষ হওয়ার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। সেই বিষয়টি হচ্ছে, যে কোনো ভালো কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা ঈমানের সাথে, আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়। জগতে ভালো কাজ অনেকেই করে। কিন্তু প্রথমত ইসলামের শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবনে পূর্ণাঙ্গ ভালোত্ব আসতে পারে না। এক অঙ্গনে ভালো তো আরেক অঙ্গনে ঠিক এর বিপরীত। স্ব-দেশের লোকদের জন্য ভালো কিন্তু অন্য জাতির জন্য মহা হিং¯্র। এরকম অজ¯্র দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। মানুষ সামগ্রিকভাবে সবার জন্য ভালো তখনই হয় যখন অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত ভালো স্বভাব, ভালো আচরণও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হয় যখন তা ঈমানের সাথে হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হয়। এটা যদি না হয়, তাহলে স্বভাব-চরিত্রগত যত ভালো গুণ রয়েছে, সেগুলো দুনিয়াতে কিছু কাজে আসে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়াতেই কিছু সুনাম-সুখ্যাতি দান করে দেন। আখেরাতে সে কোনো বিনিময় লাভ করতে পারে না।

স্বভাব ও আচরণগত ভালো কাজগুলোও তখনই প্রকৃত ভালো হয় যখন মানুষ দ্বীন-ঈমান শেখে, আল্লাহমুখিতা অর্জন করে, আল্লাহর জন্য করে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন-

النّاسُ مَعَادِنُ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ، إِذَا فَقِهُوا.

এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, যার সারকথা হচ্ছে আল্লাহ পাক মাটির নীচে অনেক রকমের মূল্যবান ধাতু ও মূল্যবান বস্তুর খনি তৈরি করেছেন। সোনার খনি, রুপার খনি, তেলের খনি ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আছে। সোনার খনির দাম বেশি। রুপার খনি আরেকটু কমদামী, কমদামী হলেও এটাও দামী। এরকম বিভিন্ন মানের বিভিন্ন রকম খনি মাটির নীচে আছে। এরকম মাটির উপরেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন স্বভাবের মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিছু মানুষ দানশীলতার ক্ষেত্রে অগ্রসর। কিছু মানুষ সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর। কিছু মানুষ ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অগ্রসর। গুণ ও যোগ্যতার মণি-মাণিক্য দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এখানে মানুষ বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন পর্যায়ের।

তো মানুষের মাঝে স্বভাবগত যেসকল ভালো গুণ আছে সেগুলো ভালো।

জাহেলি যুগে আরবে অনেক মানুষ ছিল, দানশীল। অনেক মানুষ ছিল মেহমানদার। অনেক মানুষ ছিল বীরত্বে শৌর্য-বীর্যে প্রসিদ্ধ। এরকমের বিভিন্ন গুণাবলী জাহেলী যুগেও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ছিল। একেক পরিবার, এক এক গোত্র এক এক বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত ছিল।

উপরোক্ত হাদীসে যেন বলা হল, জাহেলী যুগে স্বভাব ও চারিত্রিক বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যে যারা ভালো হিসেবে পরিচিত ছিল ইসলামেও তারা ভালো। ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এক শর্তে। সেই শর্ত হল- إِذَا فَقِهُوا যখন তারা দ্বীনের ইলম অর্জন করবে। কুরআন-সুন্নাহ্র সহীহ ইলম অর্জন করবে এবং সে মোতাবেক তার গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করবে।

তাহলে জাহেলী যুগের শ্রেষ্ঠত্ব আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে কী পার্থক্য? জাহেলী যুগে যারা ভালো ছিল, তাদের প্রাপ্তি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কিছু সুনাম-সুখ্যাতি। তারা যেহেতু ঈমান আনেনি, ইসলাম কবুল করেনি আখিরাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে তাদের কোনো প্রাপ্তি নেই। আর ইসলামে,

ইসলাম কবুল করার পরে যারা ভালো, ইসলাম কবুল করার পরে যারা শৌর্য-বীর্যের অধিকারী, মেহমানদার, দানশীল, খাইরের পথে, কল্যাণের পথে অগ্রগামী তাদের প্রাপ্তি হল, যেহেতু তার এই ভালো গুণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান মোতাবেক ব্যবহৃত হয়েছে তাই তারা এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে দুনিয়াতেও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছে, আখেরাতেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য ও সওয়াব অর্জনের উপযুক্ত হয়েছে।

তাহলে ভালো স্বভাব-আচরণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় ঐসময় যখন সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রেরণায়, আল্লাহর জন্য, আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক হয়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، إِذَا فَقِهُوا.

তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যারা তোমাদের মধ্যে স্বভাব-চরিত্রে, আচার-ব্যবহারে, আদব-আখলাকে শ্রেষ্ঠ।

এক শর্তে, সেই শর্ত কী?

إِذَا فَقِهُوا যখন তারা দ্বীনের ইলম অর্জন করে।

তাহলে চিন্তা করুন, দ্বীনের ইলম, কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম কত বড় কল্যাণ। কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলমের মাধ্যমে মানুষের গোটা জীবন শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ হয়। গোটা জীবন আল্লাহমুখী হয়। গোটা জীবনের সকল কাজ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে সন্তুষ্ট করার প্রেরণায় সম্পন্ন হয় এবং আল্লাহর বিধান মোতাবেক, হালাল-হারামের বিধান মোতাবেক, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক সম্পন্ন হয়। এইজন্য কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলম হচ্ছে 'খাইরে কাছীর'-প্রভুত কল্যাণ।

وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

যাকে হিকমাহ দান করা হয়েছে তাকে প্রভুত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

এই কল্যাণ আমাদের নিজেদেরকেও অর্জন করতে হবে, আমাদের সন্তানদেরকেও এর অধিকারী করতে হবে। একজন পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিক্ষার চেয়ে, কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলমের চেয়ে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্র পথে পরিচালিত করার

চেয়ে উত্তম উপহার আর কিছুই দিতে পারেন না। এটাই বাবার পক্ষ থেকে আদরের সন্তানের জন্য সর্বোত্তম উপহার।

আমাদের সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে সচেত হতে হবে। দ্বীনী ইলম অর্জন করার, সহীহ আকীদা জানার, ইবাদতের সঠিক নিয়ম জানার, সহীহ্ শুদ্ধভাবে কুরআন কারীম পড়তে শেখার, কুরআনে কারীম বুঝতে শেখার এবং কুরআনের আলোয় নিজের জীবনকে আলোকিত করার চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা সকল শ্রেণির মানুষকেই করতে হবে। শিশু-কিশোরকেও করতে হবে, বয়স্কদেরও করতে হবে। সর্বস্তরের ইলম চর্চা ও ইলম বিস্তারের এই ধারা কীভাবে জারি হতে পারে, কীভাবে গতিশীল হতে পারে- এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনাও করতে হবে।

আমাদের কর্তব্য, আমাদের সন্তানদের একটা ভালো ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত করে দিয়ে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ্র ইলমের পথে অগ্রসর করে দেওয়া। সামনের জীবনে সে যে শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, যে পেশায় নিয়োজিত হোক- ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, যা-ই হোক না কেন, যদি তার প্রথম জীবনে শৈশবে-কৈশোরে কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, কুরআনে কারীম হিফয করে ফেলে, তা বোঝার মত যোগ্যতা হয়ে যায়, দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো শিখে ফেলে-

তাহলে আশা করা যায়, ইনশাআল্লাহ সামনের জীবনে অবশ্যই এর প্রভাব পড়বে।

আমাদের এই অঞ্চলে এই ব্যবস্থা কম। কিন্তু আপনি আরবে যান, সেখানে মসজিদে হারামে, মসজিদে নববীতেও ব্যবস্থা আছে। ওখানে এমন ব্যবস্থাও আছে যে, স্কুলের বাচ্চারা সকালে স্কুলে পড়ে, বিকালে এসে কুরআনে কারীম হিফয করে। হিফযখানায় পুরো সময় দিলে হয়তো দুই-তিন বছরে পূর্ণ হিফয হয়ে যেত। কিন্তু স্কুলের পড়ার পাশাপাশি কুরআনে কারীম হিফয করার কারণে সময় বেশি লাগছে, চার বছর পাঁচ বছর লাগছে। ওখানে ছেলেদের স্মৃতিশক্তি ভালো, ফলে আরো কম সময়ের মধ্যেও হাফেয হয়ে যাচ্ছে। স্কুলেও পড়ছে আবার কুরআনে কারীমের হাফেযও হয়ে যাচ্ছে। এরকম ব্যবস্থা আরববিশে^ আছে। আমাদের দেশেও এরকম ব্যবস্থার বিস্তার দরকার।

আমাদের এ অঞ্চলের সাধারণ চিন্তা হচ্ছে, স্কুলে দিয়েছি তো দিয়েছি। ব্যস, কুরআন-সুন্নাহ্র সাথে আর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্য দিকে কুরআন-সুন্নাহ শিখতে এসেছে তো জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। দুই শিক্ষার মাঝে এমন দূরত্ব যে, একটাকে অবলম্বন করা হলে আরেকটা ছাড়তেই হবে; বরং সম্পূর্ণরূপেই ছাড়তে হবে। এই

চিন্তাটা কতদূর সঠিক তা ভেবে দেখা দরকার। একটা পর্যায় পর্যন্ত সম্ভবত দুটোই একসাথে হতে পারে। একজন মুসলমান কুরআনে কারীম শিখবে, কুরআনে কারীমের হাফেয হবে, কুরআন বোঝার যোগ্যতা অর্জন করবে, দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করবে এরপর পছন্দমতো কোনো পেশার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষার দিকে যাবে। এমনটাই তো স্বাভাবিক। তাহলে কুরআন-সুন্নাহ জ্ঞানের প্রভাবে ঐ পেশায় গিয়েও সে একজন মুসলিম হিসেবে তার জীবনকে পরিচালিত করতে পারবে। আল্লাহ পাক আমাদের বিষয়গুলো বোঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন!